প্রবাস জীবনের খন্ডচিত্র

উত্তর আমেরিকায় অভিবাসী বাংলাদেশীরা কেমন আছেন?

কেমন আছি আমরা, প্রবাসী বাংলাদেশীরা? অর্থনৈতিক বিচারে ভালো আছি. মোটা দাগে একথাটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। তা না হলে আর এখানে থাকা কেন? কিন্তু এই ভালো থাকাটাই কি শেষ কথা! কেমন আছি আমরা সামাজিক অর্থে, সাংস্কৃতিক মানদন্ডে, মানসিক দিক থেকে! দেশের জন্য মন টানে, সেই চিরাচরিত টানাপোড়েনটা তো রয়েইছে। তার ওপরেও এখানে, এই প্রবাসে তো আমাদের একটা সমাজ তৈরি হয়ে গেছে। সেই আমাদের তো আশা-প্রত্যাশা আছে, প্রাপ্তির আনন্দ আছে, না পাওয়ার হতাশা আছে, আছে স্বপ্ন, লক্ষ্য আর সর্বোপরি প্রবাসের কঠিন জীবনসংগ্রাম। এই সব মিলিয়ে আমরা, উত্তর আমেরিকায় অভিবাসী বাংলাদেশীরা কেমন আছি, সেটা খতিয়ে দেখার একটা প্রয়াস, এবারের মূলরচনা।

উত্তর আমেরিকায় অভিবাসী বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী সার্বিকভাবে কেমন আছে তার মূল্যায়ন এ রচনা নয়। বরং প্রবাসের কিছু খন্ডচিত্রের সম্মিলনে একটা প্রতিনিধিত্বশীল সমাজচিত্র উপস্থাপন এর লক্ষ্য। খন্ডচিত্রের জন্য আমরা বেছে নিয়েছি দুটো ধারা। প্রথমত: উত্তর আমেরিকার প্রধান শহরগুলো, যেখানে বাংলাদেশীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, এমন কিছু শহরের বাংলাদেশীদের সামাজিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, হিউস্টন এবং টরন্টোর প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে এ শহরগুলোতে বাংলাদেশীদের জীবনধারার চিত্র। দ্বিতীয়ত, পেশাগত দিক থেকেও উত্তর আমেরিকার দুটি পেশাশ্রেণীর অভিবাসীদের আমরা উপস্থাপন করেছি এ রচনায়। পেশাজীবী (ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি)রা উপস্থাপিত হয়েছেন একটি প্রতিবেদনে এবং অন্যটিতে অভিবাসী/প্রবাসী ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক শহর হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে অস্টিন।

নিউ ইয়র্ক

নিউইয়র্কে এ সময়ে বাংলাদেশীদের সংখ্যা কত? এ প্রশ্নটির সহজ উত্তর পাওয়া যাবে না। কারো কারো মতে এক লক্ষ। কারো কারো মতে সোয়া লক্ষের মতো। এ সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজ থেকে একদশক আগে যা কল্পনা করা যেতো না। এখন তাই সম্ভব হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে নিউইয়র্কগামী বাংলাদেশ বিমানের তিনটি ফ্লাইট বাংলাদেশকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। পত্র-পত্রিকা, বই, তরিতরকারী পর্যন্ত আসছে প্রায় প্রতি সপ্তাহে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী নিয়ে নিউইয়র্কে রীতিমতো চলছে প্রতিযোগিতা।

অভিবাসী জনসংখ্যার সাথে পাল-া দিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। বাড়ছে সংগঠন। আর সেই সব সংগঠনের নেতা হওয়ার জন্য চলছে কঠিন প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক কিংবা জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র ভোট নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচের সংবাদ ঝড় তুলেছে দেশে-বিদেশে। আবার কেউ কেউ ভোটে পাশ করতে না পেরে নতুন সংগঠন জন্ম দিয়ে তার নেতাও হয়েছেন। প্রতিযোগিতা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তা থেকে আর সুফল আশা করা যায় না। এমন ঘটনাবলী ঘটছে নিউইয়র্কে অহরহ।

এমন কোন উইক-এন্ড নেই যে সময়ে নিউইয়র্কে কোন অনুষ্ঠান থাকে না। স্থানীয় শিল্পীদের পদচারণা ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের কনসার্ট হচ্ছে প্রায়ই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। যা বেশ লাভজনকও হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন, বাংলাদেশ থেকে আগত মন্ত্রী, নেতা, ব্যক্তিত্বকে নিয়ে অনুষ্ঠান চলে প্রায় সারা বছর ধরে। রাজনীতিকরা আসেন। প্রবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, প্রবাসীদের দাবী আদায়ের স্বপক্ষে কথা বলেন। কিন্তু ঢাকাগামী পে-নে বসেই তারা ভুলে যান সবকিছু। এইভাবে অঙ্গীকারের বাণী শুনতে শুনতেই কেটে যায় নিউইয়র্কবাসীর অভিবাসন জীবন।

যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারী থেকে

২০০০ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের সংখ্যা এখন প্রায় ২৩০,০০০ (দুই লক্ষ তিরিশ হাজার)। এটি ১৯৯০-এর ২২,০০০ বাংলাদেশীর তুলনায় ১০ গুনেরও বেশি। এই দুই লক্ষাধিক বাংলাদেশীদের শতকরা ৪১ ভাগ থাকেন নিউইয়র্ক-নিউজার্সী এলাকায়, শতকরা ১৮ ভাগ থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে, আর শতকরা ৮ ভাগ থাকেন বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডি.সি. এলাকায়। বাকিরা আছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানান শহর ও গ্রামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের শতকরা ১৪ ভাগ ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী, শতকরা ৮০ ভাগ ১৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সী এবং শতকরা ৬ ভাগের কম ৫৫ বছরের বেশি। এদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের শতকরা ৪৩ জনের আছে গ্র্যাজুয়েট বা প্রফেশনাল ডিগ্রী; শতকরা ৬৬ জনের অন্তত: ব্যাচেলর ডিগ্রী আছে এবং শতকরা ৮৯ জনের আছে অন্তত: হাইস্কুল ডিগ্রী। আয়ের দিক থেকে অর্ধেক বাংলাদেশীদের আয় ৪০,০০ ডলারের বেশি। শতকরা ১০ জন বাংলাদেশীর আয় ১০০,০০০ ডলারেরও উপরে। উলে-খ্য যে, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে শতকরা ৫ জনের আয় ১০০,০০০ ডলারের উপরে।

নিউইয়র্ক থেকে বর্তমানে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা আটটি। এগুলো হচ্ছে - সাপ্তাহিক ঠিকানা, সাপ্তাহিক পরিচয়, সাপ্তাহিক নতুন প্রবাসী, সাপ্তাহিক এখনই সময়, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা, সাপ্তাহিক দর্পণ, সাপ্তাহিক বাঙালী এবং সাপ্তাহিক বাংলাদেশ। চক্রানুক্রমে সপ্তাহে পাঁচদিনে পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়। পত্রিকা পাঠকের সংখ্যা নিয়মানুযায়ী বাড়ছে নিউইয়র্কে। কারণ একজন নতুন অভিবাসী সব সময়ই বেশী উদগ্রীব থাকেন সদ্য ফেলে আসা মাতৃভূমির টানে।

এটা অত্যন্ত আশার কথা, নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্কুল-কলেজগুলোতে বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েরা ভালো রেজাল্ট করছে প্রতি বছর। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজে বাড়ছে বাংলাদেশী শিক্ষকের সংখ্যা। কয়েকটি সুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী শিক্ষক রয়েছেন যারা অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পালন করছেন তাদের দায়িত্ব।

ব্যবসাক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের প্রসার দিন দিন বাড়ছে বিভিন্নভাবে। এক সময় ছিল যখন ব্যবসা বলতে বাঙালীরা গ্রোসারী কিংবা রেষ্টুরেন্ট ব্যবসাকেই প্রধান্য দিতেন। সে অবস্থা এখন আর নেই। আমদানী, রপ্তানী, ট্রাভেল ব্যবসা, কম্পিউটার স্কুল, গার্মেন্টস, জুয়েলারী, বুটিক, রিয়েলএস্টেট সহ ওয়াল স্ট্রীটেও ইনভেস্ট করছেন এখন অনেক বাংলাদেশী। নিউইয়র্কে গ্রোসারী ব্যবসায় অসাধু প্রতিযোগিতার কারণে মন্দাভাব চলছে গেল দু'বছর থেকেই। অনেক গ্রোসারী হাতবদল করে এখনো বেঁচে আছে কোন মতে।

২.

নিউইয়র্কে যে বিষয়টি এখন অভিবাসী সমাজকে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে তা হচ্ছে প্রজন্মের সংকট। ব্রুকলীন, ডাউন টাউন, ম্যানহাটন, ওজোন পার্ক কিংবা এস্টোরিয়ার কোন কোন রাস্তার কর্ণারে প্রায়ই সন্ধ্যার পর দেখা যায় টিন এজ ছেলেরা দাঁড়িয়ে গাঁজা টানছে। এরা বিভিন্ন গ্রুপের সাথে মিশে ক্রমশ: মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। অনেক মা-বাবাই তো খোঁজ রাখছেন না। অথবা জানার পরও সন্তানদেরকে বাগে আনতে পারছেন না। এই প্রজন্মকে এসব অপরাধ প্রবণতা থেকে বাঁচাবার ব্যাপারে বড় বড় সামাজিক সংগঠনগুলোও প্রায় নির্বিকার।

পিতা-মাতার নির্লজ্জ জীবন যাপন, কলহ, সন্তানদের প্রতি এবিউস-এর কারণে বেশ কিছু বাংলাদেশী সন্তানদেরকে তুলে নিয়ে গেছে সিটির শিশু সদন কেন্দ্র। এদের কেউ কেউকে ছাড়িয়ে আনা গেছে। কেউ কেউ এখনো আছে সিটি কর্তৃপক্ষের আশ্রয়ে। এরপরও জঘন্য সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একশ্রেণীর নারী-পুরুষ।

অতি সম্প্রতি এস্টোরিয়ার বোহেমিয়ান পার্ক এবং হলটি আর বাংলাদেশীদেরকে ভাড়া দেয়া হবে না বলে জানিয়েছে হল কর্তৃপক্ষ। তার কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষ বলেছে, বাংলাদেশীরা সীমিত আসন সংখ্যা তোয়াক্কা না করে মাত্রাতিরিক্ত লোক সমাগম করে। তাছাড়া যত্রতত্র গার্বেজ ফেলে পার্কটিকে আবর্জনাময় করে তুলে। সম্প্রতি একটি কনসার্টে এমন কিছু লজ্জাজনক ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এটা নতুন ঘটনা নয়। নিউইয়র্কে এর আগেও বেশ কয়েকটি পাবলিক স্কুলের হল ভাড়া দেয়া বাংলাদেশীদের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে মোটেই নজর দেয়া হয় না।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারের লক্ষ্যে নিউইয়র্কে গড়ে উঠেছে মসজিদ-মন্দির। মসজিদ এবং মন্দির নিয়েও রয়েছে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতাটা। মাত্র এক ব-কের মধ্যে দুটি সমজিদ নির্মাণের মাধ্যমে নেতৃত্বের এই অশুভ প্রতিযোগিতার উদাহরণ বেঁচে আছে এস্টোরিয়ায়। আর দু'দিন চাঁদ দেখা, দু'দিন ঈদ করা - এসবও ঘটছে ঐ মসজিদ নেতৃত্বের কোন্দলের কারণে। একইভাবে দুটি গ্রুপের নেতৃত্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণও পালিত হচ্ছে গেল একদশক থেকে। ধর্মীয় বিষয়ে অনৈক্যের কারণে প্রায় প্রতিবছরই অন্য ভাষাভাষি সম্প্রদায়ের কাছে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় বাংলাদেশীদেরকে।

৩.

নিউইয়র্কে রূপসী বাংলা, বাংলা টিভি, শ্যামল বাংলা, আই অন বাংলাদেশ, বাংলা ভিশন এবং জীবনের আলো - নামে মোট ছয়টি বাংলা টিভি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন চ্যানেলে। এদের মান তেমন ভালো নয় বললেই চলে। একঘন্টা স্থায়ী প্রতিটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ টেলিভিশন কিংবা একুশে টিভির রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠানই দেখানো হয় অধিক সময়।

নিউইয়র্কে একটি সংঘবদ্ধ টিনএজ গ্রুপ গড়ে উঠেছে যারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক-সঙ্গীতানুষ্ঠানে বিনা টিকেটে ঢোকার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। এরা অনুষ্ঠানে ঢুকে নানা ধরনের অশোভন আচরণও করে মাঝে মাঝে। যার ফলে সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা রক্ষীদের দ্বারা চ্যাংদোলা করে এদেরকে বের করে দেয়া হচ্ছে প্রায়ই। এসব ঘটনাবলী প্রবাসীদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। বিশেষ করে অন্যান্য এ্যাথনিক সোসাইটির কাছে বাঙালীরা লজ্জাবোধ করছেন।

নতুন প্রজন্মকে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি শেখানোর জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্কে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এর মধ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আটর্স (বিপা), বাংলাদেশ কালচারাল একাডেমী (বিসিএ), অন্যতম। অতি সম্প্রতি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্বোধন হয়েছে। যা মূলতঃ নিউইয়র্ক ভিত্তিক। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র 'আলোকিত মানুষ চাই' শে-াগান নিয়ে বই পড়া কার্যক্রমের উদ্যোগ নিয়েছে ইতিমধ্যে। যা সুধীমহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

নিউইয়র্কে বইপত্রের দোকান গুলোর মধ্যে মুক্তধারা, অনন্যা এবং সৃজনী অন্যতম। মুক্তধারার অন্যতম আয়োজন নিউইয়র্ক বইমেলার একদশক পূর্ণ হলো এ বছর। প্রবাসে বই বিক্রী, পাঠক সৃষ্টি, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মুক্তধারা নিউইয়র্কে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে নিউইয়র্কে বাংলা অডিও, ভিডিও ক্যাসেট ও সিডির একটি ভালো বাজার গড়ে উঠেছে। আড্ডা, অবসর, মলি-কা, শ্রাবণী, সপ্তবর্ণা প্রভৃতি চমৎকার নামে গড়ে উঠেছে ক্যাসেটের দোকান। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মাঝে মাঝে ঢাকার একটি অনুষ্ঠান কোন চ্যানেলে প্রচারিত হবার আগেই নিউইয়র্কের দর্শকরা তা দেখে ফেলতে পারেন। বিশেষ করে ঈদের সময় প্রচারিতব্য অনুষ্ঠানগুলো দাম দিয়ে কিনে নিয়ে আসেন নিউইয়র্কের ব্যবসায়ীরা। তা এখানে দেখা হয়ে যায় ঈদের আগেই। প্রবাসে থেকে বাংলাদেশীরা এটি একটি বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন বৈকি!

অতি সম্প্রতি ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ম্যারী অ্যান পিটার্স নিউইয়র্ক সফরে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোন পাসপোর্টধারী নাগরিক তো বটেই, যদি কোন গ্রীনকার্ডধারী বাংলাদেশে গিয়ে পুলিশী হয়রানিসহ অন্য কোন ধরনের অন্যায়ের শিকার হন তবে

তারা যেন ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে যোগাযোগ করেন। তা জেনে প্রবাসীদের অনেকেই আশ্বস্থ হয়েছেন। জন্মভূমি বাংলাদেশে গিয়ে সেই জন্মভূমির বিভিন্ন হয়রানির শিকারের জন্য প্রোটেকশন দিচ্ছে অভিবাসী দেশটির দূতাবাস। এই দুঃখবোধ নিয়েই সময় কাটাচ্ছেন অভিবাসীরা। যা মেনে নেয়া বড় কষ্টের। কিন্তু বাস্তবতার খাতিরে আজ তা মানতেই হচ্ছে।

৪.

অভিবাস থেকেও অভিবাস হয়। সে ধারাবাহিকতায় গেল পাঁচ বছরে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী নিউইয়র্ক ছেড়ে গেছেন। তারা গিয়ে নিবাস গড়েছেন অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে। তারপরও বিশেষ করে নিউজার্সি, কানেকটিকাট, ফিলাডেলফিয়া, বস্টন প্রভৃতি শহরে যারা থাকেন তারা প্রায় প্রতি মাসেই ছুটে আসেন নিউইয়র্কে। বিশেষ করে জ্যাকসন হাইটসের সব্জী আর স্বর্ণের বাজারটি যে গৃহিনীদের খুব প্রিয়, তা প্রতিটি উইকএন্ডেই দেখা যায়। স্বর্ণের বাজারটির সিংহভাগ বিক্রেতা ভারতীয় হলেও সিংহভাগ ক্রেতা বাংলাদেশী।

বিয়ে-শাদীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গড়ে উঠেছে মুসলিম রেওয়াজ অনুযায়ী কাজী অফিস। সেসব কাজী অফিসে দু'চারটি গোপন বিয়েও সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যে। পরিবার পরিজনকে না জানিয়ে গোপনে বিয়ের কাজটি সেরেছে তারা ধর্মীয় বিধান মতেই। মোটকথা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি কালচারের ছোঁয়াই লাগতে শুরু করেছে এই অভিবাসে।

প্রতারণা, ডাকাতি, চোরাচালান, অবৈধ ড্রাগ ব্যবসা প্রভৃতি অপকর্মেও এখানে জড়িয়ে পড়েছে বেশ কিছু অভিবাসী। সংঘবদ্ধ গ্রুপের ছত্রছায়ায় এরা তৎপর রয়েছে বিভিন্নভাবে। যার ফলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো শর্ট লিস্টেও উঠে এসেছে বেশ কিছু নাম।

সবকিছু মিশিয়ে একথাটি বলা যায়, অভিবাস জীবনের সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম নয়, তীব্র প্রতিযোগিতাও করছেন বাংলাদেশীরা। বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার আয়োজনে নিউইয়র্কে প্রতিবছর আয়োজিত হচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল লীগ। ১০/১২টি টিম প্রতিবছর খেলছে এই লীগে। তাছাড়া, ক্রিকেট, দাবা, ক্যারম প্রভৃতি খেলার প্রতিযোগিতাও চলছে প্রতিবছর। অতি সম্প্রতি নিউইয়র্ক সফরকালে বিশিস্ট সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার বলেছেন, নিউইয়র্ক নগরীতে বাঙালীরা শক্তিশালী সত্বা নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হবেন- এই বিশ্বাস আমার জন্মেছে।

আলো এবং আঁধার নিয়েই জীবন। বিপুল সম্ভাবনার এই নিউইয়র্ক মহানগরীতে বাঙালী প্রজন্ম শিকড় সন্ধানী হয়ে এগিয়ে যাবে, এই প্রত্যয় আজ সকলের। বিশেষ করে মূলধারার সাথে সম্পৃক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশী আমেরিকানদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে একদিন আগামী নেতৃত্ব। যার কণ্ঠ থেকে গর্বের সাথে ধ্বনিত হবে "মাই গ্রান্ড প্যারান্টস কেম ফ্রম বাংলাদেশ।"

লস এঞ্জেলেস

'গোল্ডেন স্টেট' ক্যালিফোর্নিয়ার ঝলমলে শহর লস এঞ্জেলেস । রাতের বেলা এরোপে-ন থেকে দেখলে সত্যিই উপভোগ করা যায় এর চাকচিক্য এবং সৌন্দর্য। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সামুদ্রিক এই শহরের মোহ ও মায়া দুটোই আছে। এ শহরের মোহ দূর দূরান্ত থেকে নিয়ে আসে পৃথিবীর সব দেশের মানুষকে। এবং একবার এলে লস এঞ্জেলেসের মায়া আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে ফেলে প্রবাসীদের। শুধুমাত্র এ শহরেই আছে প্রায় দশ হাজার বাংলাদেশী। এখানকার আবহাওয়া ও কাজের সুবিধার সমন্বয়ে তৈরি হয় একটি আদর্শ পরিবেশ। বড় শহরের অনেকগুলো সুবিধার মধ্যে একটি হচ্ছে বৈধ কাগজপত্র ছাড়াও কাজ করতে পারা। ক্যালিফোর্নিয়ায় পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং লস এঞ্জেলেস এর বৃহত্তম শহর বলে এই শহরেই কর্মীর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই সুযোগ নিয়েই এখানে বাংলাদেশীদের আগমন।

লস এঞ্জেলেস বড় শহরগুলির মধ্যে পড়লেও এর গঠন অন্যান্য শহরের তুলনায় একটু ভিন্ন। অনেকগুলো ছোট ছোট উপ-শহর নিয়ে বৃহত্তর লস এঞ্জেলেস শহর তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশীদের বাস প্রধানত লস এঞ্জেলেসের প্রাণ ডাউনটাউনের ২০ মাইল পরিধি জুড়ে Mid-Wilshire ও Korean Town এই এলাকাটুকুকে 'এল. এ' বলে বোঝানো হয়। এর থেকে কিছু উত্তরে North Hollywood এলাকায় বেশ কিছু বাংলাদেশীর বসবাস আছে। আরও উত্তরে Valencia এবং Santa Clarita উপ-শহরে বেশ কিছু বাংলাদেশী খুব সম্প্রতি তাদের গৃহ-রচনা শুরু করেছে। এল. এ-কে মধ্যবিন্দু ধরে, তার দক্ষিণে Orange County-তে আরও বেশ অনেক বাংলাদেশী স্থিতি নিয়েছে। এর বাইরেও বাংলাদেশীদের বসবাস আছে যেমন Glendale, San Bernandino, Burbank উপ-শহরগুলোতে।

প্রধান এল. এ শহরে (যাকে 'মধ্যবিন্দু' ধরা হয়েছে) শতকরা ৯০ ভাগ মহিলাই বাড়িতে থেকে দক্ষভাবে সংসার পরিচালনার মাধ্যমে সংসার এবং বাইরে কর্মরত স্বামীকে সাহায্য করার ভার নিয়েছে। হাঁটাপথে বাংলাদেশী গ্রোসারী/রেস্টুরেন্ট থাকাতে ঘরের, সন্তানের কাজ শেষে পড়শী 'ভাবী'র সাথে এক কাপ চা ও প্যাটিস অথবা বেশ খানিকটা তেঁতুলের টক দিয়ে চটপটি পাওয়ার মধুর বিলাসিতাও এরা উপভোগ করেন। লস এঞ্জেলেসের কয়েকটি অন্যতম গ্রোসারী/রেস্টুরেন্টের মধ্যে আছে 'দেশী' 'আলাদিন', 'জাফরান'। মজার ব্যাপার হলো এই তিনটি গে-াসারী- কাম-রেস্টুরেন্ট একে অপরের এক মাইল পরিধির মধ্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে বিরাজমান। সম্প্রতি 'নিউ মার্কেট' নামে একটি শুধুমাত্র বাংলা, হিন্দী ভিডিও ছবির দোকান খোলা হয়েছে নর্থ হলিউড এলাকায় যেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক মসলাপাতি ও মাছের ব-ক পাওয়া যায়। এই সমস্ত দোকান যেমন বাংলাদেশী পসরা সরবরাহের জন্য বিদ্যমান, তেমনি আবার সামাজিক মেলামেশার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে।

লস এঞ্জেলেসে অনেক ভাষাভাষীর অভিবাসী আছে যেমন, হিসপ্যানিক, আর্মেনিয়ান, পাঞ্জাবী । এইসমস্ত ভাষাভাষী ছেলেমেয়েরা যারা নাকি দ্বিতীয় প্রজন্ম, তারা অবশ্য মাতৃভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। কোন কারণে বাংলাদেশী ছেলেমেয়েরা যখন থেকে স্কুলে যাওয়া শুরু করে, তখন থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া শুরু করে। বাবা, মা আবশ্যই চেষ্টা চালিয়ে যান ভাষাটিকে শেখানোর জন্য। অনেকেরই মত, বাংলা শেখানোর কোন প্রতিষ্ঠান থাকলে হয়ত এই সমস্যার একটা কার্যকরী সমাধান হতো। বাংলা গান, নাচ শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠান আছে। এমনকি অনেকে নিজের বাড়ীতে স্কুল খুলে এসব সেখান। এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা প্রসংশনীয়। কিন্তু দুঃখ হয় বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য, যাতে করে এখানকার উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষার মত সমৃদ্ধশালী ভাষার সাহিত্য পড়তে ও লিখতে পারে, তেমন কোন প্রতিষ্ঠান লস এঞ্জেলেসে এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি।

লস এঞ্জেলেসে বেশ কয়েকটি বাংলাদেশী সংগঠন আছে। এর মধ্যে আছে Bangladesh Association of Los Angeles,

Bangladesh Association of California, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Bangladesh Student Foundation of California মহিলাদের জন্য Bangladesh Womens' Organization of Southern California. প্রতিটি সংগঠনই নিজ নিজ কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত। তবে একটা কারণে কোন সংস্থাই পুরোপুরি চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছুতে পারছে না। আর সেটা হচ্ছে ঐক্যের অভাব।

লস এঞ্জেলেসে বহু ধরনের এবং শ্রেণীর কর্মজীবী আছেন। ডাউনটাউন এল.এ-র কাছাকাছি এলাকাগুলিতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বেশীর ভাগই কাজ করেন গ্যাস স্টেশনে অথবা Convenience Store-এ। একটু দূরে গেলে দেখা যাবে কিছু ব্যবসায়ী, কিছু সেলস-এর সাথে জড়িত। কেন্দ্রবিন্দু থেকে আরেকটু দূরে দেখা যাবে একাউনটেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ডাক্তার। লস এঞ্জেলেসের মত বড় শহরে ইউনিভারসিটিতে পড়াশুনা করে টিকে থাকাটা কষ্টকর। এখানে Easy Money সহজেই একজন ছাত্র/ছাত্রীকে পড়াশুনার কঠিন অধ্যবসায়ী জীবন থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। লস এঞ্জেলেসে শতকরা ৯০ ভাগ কলেজ গ্র্যাজুয়েটই এসেছেন বাইরের অঙ্গরাজ্য এবং শহর থেকে। অর্থাৎ, তারা অন্যান্য জায়গায় পড়াশুনা শেষ করে এখানে চাকরির সংস্থানে এসেছে।

'গোল্ডেন স্টেট' ক্যালিফোর্নিয়ার City of the Angels লস এঞ্জেলেস। সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, জন্মে-মৃত্যুতে আমরা সমস্ত বাংলাদেশীরা এই শহরে এই Anglesদের দ্বারা পরিবেষ্টিত! আমরা একে অন্যের দুঃখে দুঃখিত, অনেকে আনন্দিত এবং সার্থকতায় গৌরান্বিত হই। কারো পদস্খলন হলে তাকে আরও নীচে না নামিয়ে, হাত বাড়িয়ে টেনে তুললেই আসবে সকল বাংলাদেশীর মধ্যে একতা ও সৌহার্দ। আর সেই একাত্মতার ছায়ায় বড় হবে আমাদের সন্তানেরা। একদিন তারা আমেরিকার বুকে, পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আমার জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ার মোহময় লস এঞ্জেলেস শহরে। আমি মনে ও প্রাণে একজন বাংলাদেশী, কারণ আমার জন্মভূমি আমাকে শিখিয়েছে বাংলাদেশের ভাষা, দেখিয়েছে বাংলাদেশের একাত্ম জীবন আর ছেয়ে রেখেছে অনাত্মীয় খালা, মামা, চাচার মমতাময় ভালোবাসায়।'

হিউস্টন

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ শহর হিউস্টনের নামটি এসেছে জেনারেল স্যাম হিউস্টনের নাম থেকে। এ শহরটি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাপের নীচের দিকে টেক্সাস রাজ্যে অবস্থিত। অসমর্থিত সুত্র অনুযায়ী এ শহরে প্রায় সাত হাজার বাংলাদেশীদের বসবাস। তবে কখনই কোনখানে এতো বাংলাদেশীদের একসাথে দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে বড়জোর হাজার খানেক বাংলাদেশীর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে, বাকী যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন হিউস্টন শহর এবং তার পার্শ্ববর্তী উপশহর গুলোতে তারা কালে ভদ্রে কোন অনুষ্ঠানে আসেন বা তাদের উপস্থিতি বুঝতে দেন না।

যদিও স্বাধীনতা যুদ্ধের আগেও হিউস্টনে গুটিকতক বাংলাদেশী ছিলেন, যুদ্ধ সময়কালীন তাদের কাজকর্মই মূলত তাদেরকে সংঘটিত হতে সাহায্য করে। তখন হাতে গোনা কয়েকজন বাংলাদেশী, যাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যাই বেশী, ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছর ঐ ছোট্ট অথচ প্রদীপ্ত এবং সোচ্চার সংগঠনটি বছরের সবচেয়ে কার্যকরী সংগঠন হিসাবে পুরস্কৃত হয়। হিউস্টনে বাংলাদেশীদের সংগঠিত উপস্থিতির গোড়াপত্তন ঐ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন থেকেই।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরগুলোর মত হিউস্টনের বাংলাদেশীরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। সত্তর দশকের শেষের দিকে অনেক বাংলাদেশীরা হিউস্টনে এসেছেন তেল ও গ্যাস সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিয়ে। পরের দিকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পেশায় তারা প্রতিষ্ঠিত হন। বর্তমানে বাংলাদেশীদের মধ্যে বেশীর ভাগই চাকুরীজীবী, তবে ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও কম নয়। এই চাকুরীজীবীদের মাঝে একটি অংশ আছে যারা এদেশ থেকে পড়াশুনা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর একটি অংশ আছে যারা বাংলাদেশ থেকে এসে সরাসরি চাকুরীজীবী হয়েছেন। হিউস্টনে শ্রমজীবী বাংলাদেশী নেই বললেই চলে।

২.

হিউস্টনে মাত্র একটি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন রয়েছে। এটি 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, হিউস্টন' নামে পরিচিত। এই "মাত্র একটি" কথাটি অনেক তাৎপর্য বহন করে। বেশ কবছর আগেও হিউস্টনেও দলাদলি ছিল। দুটি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ছিল। কিন্তু কিছু বলিষ্ঠ এবং সাহসী মানুষের হস্তক্ষেপে এবং সাধারণ সদস্যদের চাপে দুটো সংগঠন এক হয়ে যায় এবং সে থেকে আর কোন দলাদলি হয়নি।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ছাড়াও হিউস্টনে 'বলাকা' নামে আর একটি সংগঠন রয়েছে। যাদের কর্মকাণ্ড মূলতঃ সাংস্কৃতিক এবং অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। এছাড়া 'হিউস্টন বেঙ্গলস' নামে একটি সুসংগঠিত শক্তিশালী ক্রিকেট দল আছে, যারা সম্প্রতি একটি মাঠও লিজ নিয়েছে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য। যদিও হিউস্টনে কোন প্রচ্ছন্ন দলাদলি বা এনিয়ে রাজনীতি নেই, তবু কেন যেন মনে হয় একটি অদৃশ্য দেয়াল বলাকা এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশনকে পৃথক করে রেখেছে।

সংগঠন প্রসঙ্গে একটি ঘটনা না বললেই নয়। গত দু'বছর ধরে কিছু একুশ-প্রেমী বাংলাদেশী তরুণ-তরুণী তাদের নিজেদের চেষ্টায় হিউস্টনে প্রথমবারের মত প্রভাত ফেরীর আয়োজন করে আসছে। খুব ভোরবেলায় যখন এখানকারই মত প্রভাতফেরীর আয়োজন করছিল তারা তখন অনেকেই ভেবেছিলেন কেউ আসবে না। সেই কথাকে ভুল প্রমাণিত করে বহু বাংলাদেশী ঐ শীতের ভোরে হাজির হয়েছিলেন দলমত নির্বিশেষে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে। একথা মানতেই হবে যে, নতুন প্রজন্মের এই পদক্ষেপ একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের একটি উদ্যোগ হিউস্টনের বাংলাদেশীদের নতুন করে উজ্জীবিত করেছে। সেটা হলো "বাংলাদেশ সেন্টার" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। গত কয়েক বছর ধরেই কমবেশী কিছু কাজ হচ্ছিল একটি কমিউনিটি সেন্টার গড়ে তোলার জন্য। তবে এবার অত্যন্ত দৃঢ়হাতে এই উদ্যোগকে পরিচালনা করার ফলে ইতোমধ্যে এই জমি ঠিক করা হয়েছে এবং পঞ্চাশ হাজার ডলারের মতো সংগ্রহ করা হয়েছে। জমিটির দাম প্রায় দেড় লক্ষ ডলারের মতো। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অতো টাকা না যোগাড় হয় তবে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশী অঙ্গীকার করেছেন যে তারা এই জমিটির জন্য অনুলিখন করবেন।

অতি সম্প্রতি 'বাংলাদেশ একাডেমী' নামে আরও একটি অলাভজনক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। মূলত বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শুরু করলেও এই সংগঠনটি বাংলাদেশীদের জন্য একটি ছোটখাট মিলনায়তন, লাইব্রেরী, আরবী স্কুল ইত্যাদি সুযোগের ব্যবস্থা করবে বলে আশা প্রকাশ

করেছে। গত ১৭ ই জুন রোববার এই বাংলাদেশ একাডেমীর উদ্বোধন হলো।

আরও একটি ভিন্নধর্মী সংগঠন আছে হিউস্টনে, যদিও তার কাজকর্ম এখনও সীমিত। সেটা হচ্ছে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ফটো মিউজিয়াম'। এ সংগঠনটি মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের সাথে কাজ করছে এবং হিউস্টনে একটি মুক্তিযুদ্ধ ছবি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী।

৩.

হিউস্টনের প্রধান বিশ্ব বিদ্যালয়, যেখানে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা সবচেয়ে বেশী সেটা হল ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টন। এখানে কমবেশী গোটা পঞ্চাশেক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। সেমিস্টার ভেদে এ সংখ্যা কমে এবং বাড়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী ডঃ ফজলে হোসাইনের মত ব্যক্তিত্ব অধ্যাপনা করেন। উনি ছাড়াও আরও বাংলাদেশী অধ্যাপক এখানে অধ্যাপনা করেছেন এবং করছেন।

৪.

হিউস্টন নিবাসী বাংলাদেশীরা ব্যক্তিগত ভাবে রাজনীতি সচেতন হলেও সংঘবদ্ধভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন না। সেটা এদেশের রাজনীতিই হোক অথবা বাংলাদেশের রাজনীতিই হোক। এই জন্যে হিউস্টনে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কোন শাখা নেই। যদিও এখানকার বাংলাদেশীরা এদেশের রাজনীতির মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত নন তারা কিন্তু শহরের রাজনীতি বা মেয়রের অফিসের সাথে অনেক বেশী সম্পর্কিত। এজন্য বাংলাদেশের নব্বুই এর বন্যার সময় তৎকালীন হিউস্টন মেয়র 'বাংলাদেশ উইক' এবং 'বাংলাদেশ ডে' ঘোষণা দিয়েছিলেন। যখনই প্রয়োজন হয়েছে হিউস্টনের মেয়রের অফিস তখনই বাংলাদেশীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশীরাও তেমনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তাদের সমর্থন জানিয়েছে এবং এখনও জানাচ্ছে।

৫.

হিউস্টনে বাংলাদেশীরা বিভিন্ন পেশায় জড়িত। এমন কোন নির্দিষ্ট পেশা বলা কঠিন যেটায় বাংলাদেশীরা বেশী আগ্রহী। এখানে বাংলাদেশী মালিকানাধীন চার/ পাঁচটি গ্রোসারী আছে বিভিন্ন এলাকায়। হোটেল বা রেষ্টুরেন্ট আছে মাত্র দু'টি।

যেহেতু হিউস্টনে শ্রমজীবী বাংলাদেশী বলতে গেলে নেইই, তাই এখানে মানিচেঞ্জার বা সোনালী এক্সচেঞ্জের মতো ব্যবসা গড়ে ওঠেনি। কম্পিউটার ব্যবসাতে গুটিকতক বাংলাদেশী জড়িত আছেন। এছাড়া প্রিন্টিং, গ্যাস স্টেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইনেজ, ওয়ালপেপার, টেলিকম, হেয়ার সেলুন ইত্যাদি বহু রকমের পেশায় প্রতিষ্ঠিত আছেন হিউস্টনের বাংলাদেশীরা।

৬.

হিউস্টনের বাংলাদেশীদের মাঝে ধর্মপ্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ নিয়মিত ভাবে নামাজ পড়েন এবং অপরকে পড়তে প্রেরণা জোগান। প্রায় প্রতিটি মসজিদেই বাংলাদেশীদের বহুলাংশে দেখা যায়। এছাড়া মসজিদের পরিচালনা কমিটিতেও তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। হিউস্টনে মসজিদ প্রতিষ্ঠার পেছনে বাংলাদেশীদের অবদান অনস্বীকার্য। এখানে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

৭.

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের মধ্যে হিউস্টনকেও অনেক বাংলাদেশীরা তাদের বাসভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। দেশে চলে যাব, চলে যাব করেও অনেকে নানা কারণে রয়ে গেছেন এদেশে। মাতৃভূমির কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীর আর কোন স্থানই ঐ বাংলা মায়ের স্থান নিতে পারে না। দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে, ফিরে যেতে মন চায়, কিন্তু দেশের হানাহানি, সন্ত্রাস, অরাজকতা, অস্থিরতার কথা মনে করে অনেকেই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বেছে নিয়েছেন প্রবাস জীবন। এদেশে সময় যেন বয়ে যায় অনেক দ্রুত। তাই বুঝতে বুঝতেই কেটে যায় বেশ ক'বছর। অনেকেই বলেন থাকতে যখন হচ্ছেই এখানে, এদেশের সংস্কৃতি এবং জীবনধারার মাঝেই খুঁজে নিতে হবে বাংলাদেশ। সেই জন্যেই আজও যে কোন অনুষ্ঠানে, আয়োজনে দলে দলে সবাই হাজির হন বাংলাদেশের একটু ছোঁয়া পেতে।

টরন্টো

বিশ্বের আনাচে কানাচে আজ ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালী, ছড়িয়ে পড়েছে অর্ধগোলার্ধ দূরে সুদূর কানাডার এই টরন্টোতেও। এই ছড়িয়ে পড়ার পেছনে সামনের টান এবং পেছনের ধাক্কা দুটোই কাজ করেছে। সামনে উচ্চশিক্ষার সুযোগ- পরিচ্ছন্ন জীবিকার সুযোগ, নিরাপত্তার আইনানুগ বরাভয়। পেছনে সীমাহীন দুর্নীতি, ভগ্ন শিক্ষা ব্যবস্থা, জীবিকার অনিশ্চয়তা, সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব।

এখানে স্বাধীনতার আগে বাঙালী ছিল হাতে গোনা। তবু, স্বকীয়তার সন্ধানে ছিল পূর্ব-পাকিস্তান সমিতি নিরন্তর। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণপণ খেটেছেন তাঁরা সবদিক দিয়েই। প্রাণপণ খেটেছেন ও পক্ষের দু'একজন গোলাম আজমও। কিন্তু ক্যালেন্ডারে ১৬ ডিসেম্বরের আগমন ঠেকাবার সাধ্য তাদের ছিল না।

বাংলাদেশীদের সেই সীমাবদ্ধ পদচারণা ওই রকমই ছিল আশি দশকের শেষ পর্যন্ত। বাংলাদেশ সমিতি ছিল - পৃথিবীর সব শহরের মতোই জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো, কিছু গানের জলসা এবং কিঞ্চিৎ দলাদলি নিয়ে সময়টা কেটেছে এক ভিন্ন তালে।

পরিবর্তনটা এলো তার পরে, বছর পনেরো আগে, বলা যেতে পারে 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল'। কানাডায় এমনিতে খুব ঠাণ্ডা, শীতকালে বাতাসের সাথে মাইনাস পঁয়ত্রিশে তাপমাত্রা নেমে যায় হর-হামেশাই। কিন্তু যেটা দুনিয়ার মানুষকে এখানে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, তা হল এখানকার সিস্টেম। সেই টানে এদিক ওদিক থেকে একটা দুটো করে এসে হাজির হল বাংলাদেশের 'দেখব এবার জগৎটাকে'র তরুণ মুখগুলো গড়ে উঠল রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের ব্যাচেলর মেসগুলো। সমাজের এই মেরুকরণ শেষ হবার আগেই গত দশ বছর ধরে অভিবাসী পরিবারের আগমণে, বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে এই প্রক্রিয়ার বিস্ফোরণের ফলে (প্রধানতঃ মধ্যপ্রাচ্য থেকে) এই বাংলাদেশী সমাজের এখন একটা ক্রমবর্ধমান অবস্থা চলছে অনেকগুলো দিক দিয়েই। বর্তমানে শুধু সংখ্যায় বেড়ে ওঠা ছাড়া অন্য দু'একটা উপাদান আমরা ছুঁয়ে দেখব।

একুশে, ছাব্বিশে, ষোলই আর পয়লা বৈশাখ নিয়ে অনুষ্ঠান অন্তঃপ্রাণ এ সমাজের প্রধান সংগঠন হল বাংলাদেশ সমিতি, ঐতিহ্য অনুযায়ী সেটা দ্বিখণ্ডিত, এবং শত্রুতার পর্ব পার হয়ে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চলছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-বরিশাল-সিলেট সব ধরনের সংগঠনই আছে।

স্থানীয় প্রকৌশলীদের সংগঠন আছে, আর দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়গুলো তো আছেই। সাহিত্য সংগঠন আছে একটা, উদীচীর স্থানীয় শাখা আছে। আর আছে বাংলাদেশ কল্যাণ তহবিল নামের কল্যাণ সংগঠন। বেশীরভাগ সংগঠনই মোটামুটি কর্মচঞ্চল, দলাদলির মাত্রাটা অসহ্য রকমের নয়। সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে দুটো, বাংলা কাগজ এবং দেশে-বিদেশে। দেশে-বিদেশে সম্ভবত উত্তর আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। কানাডাতে চাকরী বাকরীর অবস্থা এখন মন্দ নয়, বাংলাদেশীরা প্রায় সবাই পরিশ্রমী মানুষ, বসে প্রায় কেউই নেই। আদমশুমারী হয়নি কখনো, তবে মনে হয় হাজার বারো বাংলাদেশী আছেন এখানে। আশ্রয়প্রার্থীদের বড় একটা অংশের একটা হিলে- হয়ে গেছে, সংখ্যা আগের চেয়ে কম। মোটামুটি এখনকার অবস্থাটা হল- অনিশ্চিত সংগ্রামের পালা শেষ করে নিশ্চিত সংগ্রামে ব্যস্ত, অনেকে প্রতিদিন নতুন সংগ্রামীরাও এসে পৌচোচ্ছেন। সবকিছুর মধ্যে যে জিনিসটা স্পষ্ট তা হল সবার বুকের ভেতরেই একটা করে মিষ্টি জননী জন্মভূমি লুকিয়ে আছে। সেখানে নিয়তই 'কোন রাতের পাখী গায় একাকী, সংগীবিহীন অন্ধকারে' স্মৃতিতে অজস্র মায়াময় বাংলার সন্ধ্যা মিছেমিছিই নেমে এসে দুচোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়।

প্রিয়তমার জন্য সুমন চাটুজ্জে গেয়েছেন, 'বহুদূর হেঁটে এসে তোমাকে চাই।' আর আমরা যারা শিকড়হীন ভাসমান উদ্বাস্তু হলাম, তারা স্বর্গাদপী গরীয়সী জননী জন্মভূমিকে বলি- 'বহু দেশ ঘুরে এসে তোমাকে চাই'।

পেশাজীবী

বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাজুয়েটেরা ১৯৭৮ সনের দিকে উত্তর আমেরিকাতে উচ্চ শিক্ষার্থে আসতে শুরু করে। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে লেখাপড়া করা গ্রাজুয়েটেরাও এর আগে এদেশে এসেছে। তবে তাদের সংখ্যা তত বেশী হবে না।

১৯৮০ দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশী গ্রাজুয়েটেরা এদেশে মাস্টার্স/ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করতে শুরু করে। এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসে এই পেশাজীবীরা নানা জায়গায় চাকরি পায় এবং নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং এর কাজ শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ প্রকৌশলী ও স্থপতি সম্প্রদায় ১৯৮৩ সনের পেশাজীবী সমিতি প্রতিষ্ঠার্থে জোরেশোরে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে এবং ১৯৮৪ সনে প্রবাসী বাংলাদেশী প্রকৌশলী/স্থপতি সম্প্রদায় পেনসিলভ্যানিয়া অংগরাজ্যে আমেরিকান বাংলাদেশী প্রকৌশলী/স্থপতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে এই সমিতি আইটি পেশাজীবীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। আজ প্রকৌশলী/স্থপতি/আইটি পেশাজীবী সমিতি আমেরিকার বিভিন্ন অংগরাজ্যে নয়টি শাখা খুলেছে।

এদেশে প্রবাসী বাংলাদেশীরা আরো কয়েকটি পেশাজীবী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে, উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী ডাক্তারদের সমিতি, জীববিদ্যা/রসায়ন পেশাদারী প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনীতিকদের সমিতি। এই সমিতিগুলো বেশ বড় বড় এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া বাংলাদেশ উন্নয়ন উদ্যোগ (বিডিআই), বাংলাদেশ-আমেরিকা বন্ধুত্ব সংঘ(বাফি), টেকবাংলা ইত্যাদি নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সামনে রেখে আলোচনা-অনুষ্ঠান/ সেমিনার আয়োজন করছে, বই/জার্নাল/পত্রিকা প্রকাশনা করছে এবং রাজনৈতিক লবি করছে। আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে শুনেছেন, বাফি এবং আমেরিকার বিভিন্ন এলাকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ইউএস কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন কংগ্রেসম্যান কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ ককাস্ তৈরি করেছেন।

বর্তমানে উত্তর আমেরিকাতে সর্বমোট কতজন প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাদারী ব্যক্তি বসবাস করছে তার পরিসংখ্যান আমার কাছে নেই। অন্যতম প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবী সম্প্রদায় হচ্ছে : ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি, আইটি বিজ্ঞানী, জীব/রসায়ন/কৃষিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ্যা বিশারদ, পদার্থবিদ ইত্যাদি। উত্তর আমেরিকার বড় বড় শহরগুলোতে (নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, টরন্টো, শিকাগো, হিউসটন, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন-ডিসি, ডালাস, আটলান্টা ইত্যাদি) প্রবাসী বাংলাদেশী তথা বাংলাদেশী পেশাজীবীদের ঘন-বসতি। প্রবাসী পেশাদারীদের প্রায় সবাই ভাল চাকরি করে। এর মধ্যে অল্প সংখ্যার পেশাজীবী এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। দুই/একজনকে বাদ দিলে অধিকাংশ বাংলাদেশী পেশাজীবীরা ছোট ও মধ্যম গোছের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছে।

হাতেগোণা কয়েকজন বাংলাদেশী নিজেদের কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এদের মধ্যে কয়েকজনের ব্যবসা সফলভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট পেশাজীবীরা ছোট-বড় নানান কোম্পানিতে কাজে নিয়োজিত। তবে দুয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ পেশাজীবীরা মূলত টেকনিক্যাল কাজে নিয়োজিত। উচ্চ ব্যবস্থাপনা পদে যেতে বাংলাদেশীদের আরো অনেক সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে।

এদেশসহ পৃথিবীর কোথাও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ভাল না। শিল্পোন্নত দেশে বাংলাদেশকে দারিদ্র্য, হতাশা ও অসহায়ত্বের প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে, প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবী সম্প্রদায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা গভীরভাবে অনুধাবন করতে অক্ষম। কেউ কেউ গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, বার্ড ইত্যাদি এনজিও সামনে রেখে নিজেদেরকে প্রবোধ দিতে চায়। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের মূল উন্নয়ন সমস্যার সমাধান হয় না। শিল্পোন্নয়নের সংজ্ঞায় বাংলাদেশের উন্নয়ন কাজ এখনো শুরু হয়নি। কৃষি ও ছোটখাটো কুটিরশিল্প জাতীয় কাজ বাংলাদেশে হাজার বছর আগেও হয়েছে। পুরোনো পদ্ধতির উৎপাদনশীলতা কম। আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি বাস্তবায়নে জটিল চিন্তা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন। জটিলতা যত বাড়ে, উৎপাদনশীলতাও আনুপাতিকহারে বাড়তে থাকে। স্পষ্টত উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যোগ-সংযোগ ঘটলে সঠিক উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। আমরা সবাই এই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার আশায় অপেক্ষা করছি।

পেশাজীবীদের মধ্যে আরেকটি ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝি রয়ে গেছে। এই প্রবণতা একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদন/উৎপাদন-ক্ষমতা সৃষ্টি হলে উৎপাাদিত পণ্য (যেমন ঃ কাপড়-চোপড়) বাজারে না ছেড়ে নষ্ট করে ফেলা ভাল। তাতে বাজার রক্ষা হয়। অপরদিকে, একই অবস্থা চলাকালে অর্থাভাবে এইসব কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের শরীর নিরাবরণ থাকে। প্রবাসী পেশাজীবী এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনুরূপ একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রবাসী পেশাজীবীরা ভাবে তারা নানান ধরনের কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং বাংলাদেশ সরকার উন্মুক্তচিত্তে তাদের জ্ঞান কাজে লাগাবার জন্য এগিয়ে আসবে। পেশাজীবীরা বাংলাদেশের কাঠামোগত সাংগঠনিক সমস্যা বুঝতে অপারগ।

আমি দেখেছি, প্রবাসী পেশাজীবীরা মহা-উৎসাহে প্রকল্প হাতে নিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। এই অবস্থায় অধিকাংশ পেশাদারী বাংলাদেশের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে যাদের ন্যুনতম ধারণাও আছে তারা কখনো আশা ছাড়বে না।

ছাত্র : অস্টিন

অস্টিন-কে এখনও অনেকে মনে করে মূলত ছাত্রছাত্রীদের শহর। এটা শুধু বাংলাদেশীদের মধ্যে নয়- এমনটি এখানকার নিজস্ব লোকজনেরও ধারণা। এমন ভাবার কারণও বেশ যুক্তিসঙ্গত। University of Texas at Austin যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় বিশ্ববিদ্যালয়, এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও উপরে। এছাড়াও পুরো শহরের আশপাশ জুড়ে আছে নিদেন পক্ষে আরও ৪/৫টা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোটা কয়েক কম্যুনিটি কলেজ। এসব মিলিয়ে অস্টিনের সংস্কৃতিটাই অনেকটা গড়ে উঠেছে ছাত্র-ছাত্রীদের কেন্দ্র করে। অবশ্য গত কয়েক বছর ধরে অস্টিন শহরের চাকরি বৃদ্ধির পরিমাণ এত বেড়েছে যে সত্যিকার অর্থে অস্টিনের মূল অর্থনীতি এখন আর ছাত্র-ছাত্রীদের দখলে নেই। বিশেষত প্রযুক্তিবিদ্যার হাত ধরে অস্টিনের বৃদ্ধি এখন অনেক শহরের জন্যই ঈর্ষার ব্যাপার। একই ধারা এখন বাংলাদেশীদের মধ্যেও।

১৯৮৮ সালের কথা, আমার প্রথম পদার্পণ অস্টিন শহরে। সব মিলিয়ে গোটা তিরিশ জন ছিলো বাংলাদেশী ছাত্র। হাতে গোণা ছিল ২/৩টি চাকুরিজীবী পরিবার।। মাঝখানের এই তের বছরে সেই চাকুরিজীবীর সংখ্যা এখন প্রায় দু'শর উপরে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম করে হলেও ৬০/৭০ জন। এখনকার চাকুরিজীবীদের একটা বিরাট অংশ এখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকদের নিয়েই গঠিত। একই সাথে বেড়ে গেছে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও, যদিও চাকুরিজীবীদের তুলনায় নিতান্ত অল্পহারে। একই সাথে পরিবর্তন এসেছে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মানসিকতারও। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সাথে সাথে বাংলাদেশী ছাত্ররাও তাড়াতাড়ি পড়াশুনা শেষ করে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে চাকুরীর মোটা অংকের বেতনের বেড়াজালে। অবশ্য অতি সম্প্রতি এখানকার অর্থনীতির মন্দার সাথে বেশ কিছু পরিবর্তনও চোখে পড়ছে। গত ২/৩ বছর যেসব ছাত্র সামারে একাধিক কাজের সুযোগ পেতো- সেখানে এবার গড়ে একটা সুযোগ পেলেও বর্তে যাচ্ছে। স্নাতক ছাত্র-ছাত্রী অনেকেই এখন চিন্তা করছে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা শুরু করার জন্য। সব মিলিয়ে কিছুটা হলেও পুরানো মানসিকতা ফিরে আসছে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

অস্টিনের সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রীই হচ্ছে Undergraduate level -এ। কেউ বা আসছে অন্য শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বদলে, কেউ বা আসছে বাংলাদেশী হিসেবে অন্য দেশ থেকে (মূলত মধ্যপ্রাচ্য থেকে), কেউবা আসছে সরাসরি বাংলাদেশ থেকে আর কেউবা এখানেই বড় হয়ে ঢুকছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই শেষের সারির সংখ্যাই দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে এবং সবচে' বড় সুখবর হলো এদের মধ্যে প্রায় সবাই অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করছে। অবশ্য শুধু এদের কৃতিত্বের কথা বললে অন্যান্য বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অবিচার করা হবে। পরিসংখ্যানের কথা বলতে পারবো না- তবে আমার মতে, এখানকার বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী অধিকাংশরাই বেশ ভালো ফলাফল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোচ্ছে। অল্পকিছু সংখ্যক- যারা পড়াশুনার ব্যাপারে অতটা মনোযোগী নয়- তাদের ফলাফলই ভালো হচ্ছে না। বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে, তারা মূলত উচ্চ বা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই আসছে- এটা অবশ্য সত্যি যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো শহরের জন্যই। গত কয়েক বছরে অবিবাহিত ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে বেশ দ্রুত হারে। এদের অনেকেই আসছে তাদের বড় ভাই-বোনদের পথ ধরে। এখনও প্রযুক্তিবিদ্যার হাতছানিতেই সবচে' বেশী বাংলাদেশীরা ধরা দিচ্ছে। সিংহভাগ ছাত্রছাত্রীরাই পড়ছে Computer Science-এ। এছাড়াও জনপ্রিয় বিষয় হচ্ছে Electrical Engineering, MIS, Business, Economics। কলা বিভাগের বিষয়গুলোতে বাংলাদেশীরা প্রায় নাই বললেই চলে। অন্যান্য বড় শহরগুলোর মত অস্টিনেও অনেকেই প্রথমে ভর্তি হয় এখানকার কম্যুনিটি কলেজগুলোতে। অস্টিনের সবচে' বড় কলেজটির নাম Austin Community College (ACC) -যাদের সব মিলিয়ে আছে পনেরো হাজারেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী। এমনিতে এসব কলেজগুলো ২ বছরের Associate degree দেয়, কিন্তু এদের বেশ কিছু Certificate program আছে- যেগুলো চাকুরীপ্রাপ্তির জন্যে খুবই উপযোগী। বেশ কিছু অনিয়মিত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী এ ধরনের সময়োপযোগী কোর্স নিয়ে সহজে ঢুকে পরছে চাকরি জীবনে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে University of Texas at Austin সবচে' বড় এবং সবচে' জনপ্রিয়। বেশকিছু বাংলাদেশী অবশ্য পাড়ি জমায় অস্টিন থেকে ৩০ মাইল দূরে আরেকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় Southwest Texas State University -তে। এছাড়াও আছে ২/৩টা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়- যাদের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম আর খরচও তুলনামূলকভাবে বেশী।

অধিকাংশ বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীরাই এখানে বাইরের Apartment -এ থাকে- কয়েকজন এক সাথে। অনেকেই পছন্দ করে স্কুলের খুব কাছাকাছি থাকতে, যাতে হেঁটে যাওয়া আসা করা যায়। অবশ্য কিছুটা বাসা ভাড়া বাঁচানোর জন্য অনেকে থাকে একটু দূরে- কিন্তু সেটা নির্ভর করে এখানকার বাস রুটের ওপরে। UT-র বাস সার্ভিস এত ভালো যে নিজেদের কোন গাড়ী-ঘোড়া ছাড়াই এখানে অনেকে তাদের ছাত্রজীবন পার করে দিতে পারে। অবশ্য, কেউ কেউ আছে যারা পুরানো গাড়ী কিনে নেয়- নিজের ইচ্ছেমত টুকটাক এখানে ওখানে যাবার জন্য।

অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরাই এখানে on-campus ছোটখাটো কাজ করে- কিছুটা হাতখরচ পাবার জন্য। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের মোটামুটি সবারই assistantship আছে-যাতে তাদের tuition দিতে হয় বা এবং মাসে মাসে চলার মত কিছু পয়সা তাদের হাতে আসে। Undergraduate-এ যারা এ ধরনের সুযোগ পায়- তারা ভীষণ সৌভাগ্যবান। তাদের সংখ্যা বিরল। কিন্তু, অধিকাংশরাই কাজ করে কোন বিভাগীয় ল্যাব-এ, লাইব্রেরিতে, grader বা tutor হিসেবে বা স্কুল কলেজের বইয়ের দোকানে।

সবকিছু বিশে-ষণে এটা পরিষ্কার - অন্যান্য যে কোনো জায়গার মত এখানকার ছাত্রজীবন কষ্টের। প্রচণ্ড মনোবল, অসীম ধৈর্য্য, অমানুষিক খাটুনি- এসবই হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। তাদের সামনে শুধু একটাই লক্ষ্য, একটাই স্বপ্ন- ভবিষ্যতের স্বচ্ছল, সুন্দর জীবন। ❐

প্রতিবেদক :
নিউ ইয়র্ক : ফকির ইলিয়াস, লস এঞ্জেলেস : রাহাত আজিম,
হিউস্টন : আজাদুল হক, টরন্টো : ফতে মোল-া,
পেশাজীবী : আশরাফ আলী, ছাত্র (অস্টিন) : সাইফুল ইসলাম নির্তন।